অধ্যায় ৬ : মনসামঙ্গল

বিন্যাসক্রম

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৬.২ পরিচিতি
৬.৩ গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি
    ৬.৩.১ কবি পরিচিতি
    ৬.৩.২ গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ
    ৬.৩.৩ রচনাকাল
৬.৪ কাহিনি বিন্যাস
৬.৫ চরিত্র-চিত্রণ
    ৬.৫.১ মনসা
    ৬.৫.২ চাঁদ সদাগর
    ৬.৫.৩ লখিন্দর
    ৬.৫.৪ বেহুলা
    ৬.৫.৫ সনকা
    ৬.৫.৬ বচাই
৬.৬ সমাজ ভাবনা
৬.৭ কাব্যমূল্য বিচার
৬.৮ মঙ্গলকাব্য হিসেবে বিজয়গুপ্তের কাব্যের সার্থকতা বিচার
৬.৯ অধ্যায়টি পড়ে আমরা কী শিখলাম
৬.১০ অতিরিক্ত পঠন
৬.১১ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত
৬.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে আপনি—

- বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' গ্রন্থটি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মঙ্গলকাব্য হিসেবে বিজয়গুপ্তের কাব্যের সার্থকতা বিচার করতে সক্ষম হবেন।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হবেন।

- 'মনসামঙ্গল' কাব্যপাঠের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন।
- 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- 'মনসামঙ্গল'-এর কাব্যমূল্য বিচার করতে পারবেন।

৬.২ পরিচিতি

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ধারা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য। গোটা মধ্যযুগে বিভিন্ন কবি, বিভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলকাব্য ধারায় নিজেদের কৃতিত্ব রেখে গেছেন। এই মঙ্গলকাব্য ধারাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, বাসুলীমঙ্গল ইত্যাদি।

চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগে বেশ কয়েকজন কবি মনসামঙ্গল রচনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখ। এছাড়াও মনসামঙ্গলের কবি হিসেবে কানা হরি দত্তর প্রসঙ্গটি বিজয়গুপ্তের কাব্যে উল্লেখ থাকলেও তাঁর গ্রন্থটির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (২য় খণ্ড) জানান—

> "মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ও পূর্ববঙ্গের বিজয়গুপ্তের কাব্যের প্রচার হইয়াছিল সর্বাধিক... বিজয়গুপ্তের কাব্য পূর্ববঙ্গে এত অধিক চলিয়াছিল যে গায়েন ও লিপিকারদের হস্তক্ষেপের ফলে বিজয়গুপ্তের মূল রচনার অতি অল্পই রক্ষা পাইয়াছে।"

এই বক্তব্য থেকে অনুমান করতে পারি যে বিজয়গুপ্তের কাব্যের নামকরণ নিয়েও বিভিন্নতা ও সংশয় থাকাটা স্বাভাবিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শ্রীজয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত গ্রন্থটি হচ্ছে 'বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ', অসিতকুমারও বিজয় গুপ্তের কাব্যটি 'পদ্মাপুরাণ' বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে সুকুমার সেন "বিজয় গুপ্তের 'মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ' " বলে উল্লেখ করেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। আবার অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত গ্রন্থটি হচ্ছে 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল।' বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের দেবখণ্ড অংশে 'মনসার জন্মপালা' থেকে শুরু করে 'বনবাস পালা' পর্যন্ত পাচ্ছি। অন্যদিকে নরখণ্ড শুরু হচ্ছে 'হাসন হুসন যুদ্ধ পালা' দিয়ে এবং সমাপ্ত হচ্ছে 'স্বর্গারোহণ পালা'-য়।

৬.৩ গ্রন্থ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

৬.৩.১ কবি পরিচিতি

পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার গইলা গ্রামে (সে যুগে ফুল্লশ্রী বলে পরিচিত) বিজয় গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন— 'পশ্চিমে ঘাগর নদী পূর্বে গণ্ডেশ্বর'। এছাড়াও ফুল্লশ্রী গ্রামটিকে কবি 'পণ্ডিত নগর' বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে যে বিভিন্ন জাতির বসবাস ছিল সে-কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—

'চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। বৈদ্যজাত বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল।।
কায়স্থজাতি বসে তথা লিখনের সুর। অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর।।'

তাঁর পিতার নাম সনাতন এবং মাতৃ রুক্মিণী। এই কয়েকটি তথ্য ছাড়া কবির ব্যক্তি-পরিচয় সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর জন্মসাল বা তারিখ কোথাও উল্লেখ নেই। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তিনি আবির্ভূত হন।

৬.৩.২ গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ

বিজয়গুপ্ত তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্য-রচনার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে 'শ্রাবণ মাসের রবিবার মনসা পঞ্চমী'-তে দেবী মনসা কবিকে স্বপ্ন দেখান এবং আদেশ করেন 'গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবক'। দেবী মনসা কেনই-বা বিজয় গুপ্তকে কাব্যরচনার আদেশ দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাও উল্লেখ রয়েছে বিজয় গুপ্তের কাব্যটিতে। দেবী স্বপ্নাদেশে উল্লেখ করেছেন— 'সর্বলোকে গীত গাহে না জানে মাহাত্ম্য। প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত।' কিন্তু সেই হরি দত্তের ত্রুটিপূর্ণ কাব্য কালের গভীরে হারিয়ে গেছে—

'কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুন্দর। এক গাইতে আর গাই নাহি মিত্রাক্ষর।।
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছে লাফফাল। গীত শুনিয়া মোর উপজে বেতাল।।'

উল্লেখ্য, হরি দত্ত এখানে তীব্র ভাষায় সমালোচিত হলেও এই সমালোচনাই তাঁকে অমরত্ব প্রদান করেছে।

৬.৩.৩ রচনাকাল

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের রচনাকাল নিয়ে নানা সংশয় রয়েছে, কারণ কবি এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ উল্লেখ করেননি বরং কালজ্ঞাপক কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে পুথিভেদে বেশ কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাই—

১/ ঋতু শশী বেদ শশী শক পিরিমিত । (১৪১৬ শক / ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ)

২/ ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। (১৪০০ শক / ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ)

৩/ ঋতু শূন্য বেদ শশী পিরিমিত শক। (১৪০৬ শক / ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দ)

এই তথ্যের দ্বারা কী ইঙ্গিত করা হচ্ছে সেটা উদ্ধার করার একটি রীতি রয়েছে। প্রথমে সংখ্যাসূচক বিশেষ্য পদগুলির সংখ্যা নির্ণয় করতে হয়, যেমন— ঋতু = ৬, শশী= ১, বেদ= ৪ এবং শশী=১ অর্থাৎ ৬১৪১। এই সংখ্যাটিকে উল্টো করে লিখলে দাঁড়ায় ১৪১৬ শক। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'অঙ্কস্য বামাগতি'। এর সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে আমরা শকাব্দকে খ্রিস্টাব্দে পরিবর্তিত করতে পারি, যেমন ১৪১৬ + ৭৮ = ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

অসিতকুমার বলেছেন, 'বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।" কারণ ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে হোসেন শাহ গৌড়ের সুলতান হন (বা. সা. ই.)। ভূদেব চৌধুরীও প্রথমটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন। সুকুমার সেন মনে করেন, "ঋতু শূন্য বেদ শশী বলিতে ১৮০৪ অর্থাৎ ১৪৮৪ অব্দে। হোসেন-শাহার সিংহাসন লাভ করিতে তখনও বছর দশেক বাকি। সুতরাং এ তারিখ অগ্রাহ্য।" (বা.সা.ই, ১ম খণ্ড)। সুকুমার সেনের এই যুক্তিকে খণ্ডন করে এবং তৃতীয় তথ্যটিকে সমর্থন করে অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর 'বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন যে কাব্যে উল্লিখিত হোসেন শাহ ইতিহাস খ্যাত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নন— তিনি জালালউদ্দিন ফতে শাহ। ইনি হোসেন নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। অতএব আমরা লক্ষ করলাম যে কাব্য রচনার সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বেশ মতানৈক্য রয়েছে।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। কবি বিজয়গুপ্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনাকাল বিষয়ে লিখুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ কাহিনি বিন্যাস

'মনসার জন্ম' পালায় দেবীর জন্মকাহিনি মুখ্য বিষয় হলেও পালাটি শুরু হয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা দিয়ে। কবি গ্রন্থ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনসার স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং নিজের আত্মপরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। মূল কাহিনিতে দেখা যায় যে নারদের কথায় শিব

চণ্ডিকার অপূর্ব পুষ্পবনে গোপনে পরিদর্শন করতে যায়। সেই বাগানের অপূর্ব পরিবেশে মুগ্ধ শিবের কাম ভাব জাগ্রত হলে তার 'অক্ষয় ধন' বা 'মহারস' পদ্মপত্রে স্খলিত হয়। কবি ব্যাখ্যা করেছেন— 'পদ্মপত্রে হইয়া বন্দি / পাইয়া মৃণাল সন্ধি / পাতালে নামিল মহারস।' এভাবেই পাতালে মনসা শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করল। ব্রহ্মা তার নামকরণ করল। পদ্মপাতায় জন্ম বলে তার নাম হল 'পদ্মা', শিবের মন থেকে জন্ম বলে 'মনসা' এবং বিষমুখ দেখে নাম হল 'বিষহরী'। যেহেতু মনসা মহাদেবের কন্যা, তাই জন্মমাত্রই 'অষ্টম বরিষ'-এ পরিণত হল এবং তার রূপ দেখে শিবের ভ্রম হলে মনসা নিজের পরিচয় প্রদান করল এবং পিতা-কন্যার মিলন হল।

'গৌরী কোন্দল' পালার মূল বিষয় হচ্ছে মনসা ও গৌরী অর্থাৎ চণ্ডীর সংঘাত। পালার শুরুতে বচাই নামক এক চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। সে শিবের অনুপস্থিতে একটি ফুলের সাজি উদ্ধার করে এবং সেটার ঢাকনা খুলে দেয়। সেখান থেকে মনসা বেরিয়ে আসে এবং মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে বচাই তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মনসার বিষ নয়নের প্রকোপে বচাই'র তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। অবশেষে পিতা শিবের কথায় মনসা বচাই'র প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। বচাই এরপর মনসাপুজোর আয়োজন করে এবং দেবী তুষ্ট হয়ে তাকে রাজা হওয়ার বর দিয়ে পিতার সঙ্গে কৈলাসে যাত্রা করে। উল্লেখ্য, এটাই মনসার প্রথম পুজো প্রাপ্তি। কৈলাসেও শিবের অনুপস্থিতিতে গৌরী সাজির ভেতর থেকে মনসাকে উদ্ধার করে এবং সপত্নী আশংকায় মনসাকে প্রহার করতে থাকে, 'বুকে পৃষ্ঠে মারে দেবী বজ্র চাপড়। / মারনের ঘায়ে পদ্মা কাঁপে থরথর'। সংঘাত চরমে পৌঁছালে মনসা উপায়ান্তর হয়ে অবশেষে 'চণ্ডীর হৃদয়ে দিল ভীষণ-কামড়'। কালবিষের জ্বালায় চণ্ডী প্রাণ হারায়। কবি বর্ণনা করছেন, 'শক্তিময়ী মহামায়া সৃষ্টির সহায়। / হেনজন প্রাণ দিল মনসার ঘায়।' এখানেও শিবের কথায় অবশেষে মনসা চণ্ডীর প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

'মনসার বিবাহ' পালায় নারদের ঘটকালিতে জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিয়ে ঠিক হয় এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তা সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু ভোরে জরৎকারু মনসাকে ফুল সংগ্রহের আদেশ দিলে মনসা প্রথমে সেটা অবজ্ঞা করে। কিন্তু স্বামী যখন মনসার আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে গালাগাল শুরু করে—

'আর দেবের কন্যা হইলে কহিতে থুইতাম কথা।
দণ্ডের বাড়ি দিয়া তোর মুই ভাঙ্গিতাম মাথা।'

তখন মনসা বিষ-নয়নে মুনির দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে জরৎকারু প্রাণ হারায়। অবশেষে এখানেও শিবের কথায় মনসা স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দিল। সংসারকর্মে অনিচ্ছুক জরৎকারু যাওয়ার পূর্বে মনসাকে অষ্টনাগ পুত্রবর প্রদান করে বিদায় নেয়।

কাব্যের পরবর্তী অংশে গৌরী ও মনসার সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। গৌরী অর্থাৎ চণ্ডীর অভিমানে অবশেষে শিব মনসাকে বনবাসে পাঠিয়ে নিজেও মর্মাহত হয় এবং তার অশ্রু থেকে জন্ম নেয় নেতা।

শিবের নির্দেশে এই নেতাই পরবর্তীকালে মনসার উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। বনবাসকালে মনসা জয়ন্তী নগরী স্থাপন করে সেখানকার রানি হলেও সর্বস্তরে পুজো পাওয়ার বাসনা তাকে অস্থির করে তোলে।

কাব্যের নরখণ্ডের প্রথম পর্যায়ে নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে দেবীর পুজো প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। জুয়ায় আসক্ত লাটিক তথা তার সাঙ্গপাঙ্গকে প্রলোভন দেখিয়ে মনসা রাখাল-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়। 'হাসন হুসন যুদ্ধ পালায়' কবি সেযুগের মুসলমান শাসকদের প্রসঙ্গ তুলে আনার পাশাপাশি ধর্মীয় সংঘাত এভাবে বর্ণনা করেছেন—

'যে যে ব্রাহ্মণ পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।।'

রাখালরা মনসার কৃপায় রাতারাতি প্রতাপী ও ধনবান হয়ে ওঠে ও বনমধ্যে ধুমধামে মনসা পুজোর আয়োজন করে। সেটা প্রত্যক্ষ করে তকাই নামে মোল্লা 'খোদা খোদা বলি যায় ঘট ভাঙ্গিবার।' এতে রাখালেরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে খুব সায়েস্তা করে। এই খবর পেয়ে হাসন-হুসন মনসার ভক্তদের আক্রমণ করলে মনসা সাপ পাঠিয়ে তাদের শাস্তি প্রদান করে ও অবশেষে মুসলমান সমাজেও পূজিত হয়।

মনসার পুজোপ্রাপ্তির বাসনা এখনও মেটেনি কারণ সমাজের উচ্চবর্গের কাছে সে উপেক্ষিতা। ফলে চম্পক নগরের বণিক চাঁদ সদাগরকে মনসা এবার লক্ষ্য করে পুজো আদায়ের প্রয়াস চালায়। কিন্তু শৈব চাঁদ সদাগর এতে অমান্তি হলে কাব্যের মূল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত মনসার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী আমরা খুঁজে পাইনি। কিন্তু চাঁদ সদাগর যখন মনসা পুজোয় বাধা দিয়ে ঘট ভেঙে ফেলে এবং স্ত্রীকে বলে— 'অঙ্গহীন দেবতার পূজা আছে মানা', তখন সেই সংঘাত তীব্রতর হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ নিতে মনসা চাঁদের বাগানবাড়ি ধ্বংস করে দেয় যা বর্ণিত হয়েছে 'গুয়াবাড়ি কাটা পালা'-য়। কিন্তু চাঁদ সদাগরও হার মানতে রাজি নয়। সে তার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বন্ধু ধন্বন্তরির সাহায্যে বাগানবাড়ি আবার পূর্বের মতো বাঁচিয়ে তোলে, 'দেখিল নন্দনবাড়ি হইয়াছে ছারখার। / আবাহন মন্ত্রে ওঝা জিয়াইল আরবার।।'। এতে মনসা ক্রোধিত হয়ে ধন্বন্তরিকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করে এবং মালিনী, গোয়ালিনী, সাহেলা, এমনকি কমলার (ধন্বন্তরির স্ত্রী) বেশ ধারণ করে তাকে মারতে সক্ষম হয়। বন্ধুবিয়োগে দুঃখিত চাঁদ তবুও বশ্যতা স্বীকার করছে না দেখে ছলনাময়ী মনসা এবার নটীবেশে চাঁদের কাছ থেকে মহাজ্ঞান হরণ করে নেয় এবং তার ছয়পুত্রকে বধ করে। কিন্তু এতেও চাঁদের মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় না, বরং সে স্ত্রী সনকাকে শাসন করে বলে— 'আর যদি শুনি আমি পুজহ কাণিরে। / আর না থুইব প্রাণ তোমার শরীরে।।'

'ঝালুবাড়ির পূজা পালা'-য় মনসা তার ভক্ত সনকাকে পুত্রপ্রাপ্তির বর প্রদান করে। অন্যদিকে স্বর্গের অনিরুদ্ধ-উষা নৃত্যগীতে সামান্য ভুল করে শিবের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে লখিন্দর-বেহুলা রূপে জন্মলাভ করে, 'অনিরুদ্ধের জন্ম হবে সোনেকার উদরে। / ঊষা জন্ম লওয়াইব সাহে বানিয়ার ঘরে।' সনকাকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে চাঁদ সদাগর বাণিজ্যযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। 'যাত্রাপাটন' পালায় কবি

বিজয়গুপ্ত নদীমাতৃক বঙ্গদেশের সুন্দর ছবি এঁকেছেন। বস্তুবদল পালায় কীভাবে চাঁদ বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানকার মূল্যবান সামগ্রী সামান্য বস্তুর বদলে উপার্জন করছে তা সরস ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মনসার প্রকোপে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা নানা বিপদের মুখোমুখি হয় এবং সে কোনো মতে প্রাণে রক্ষা পেলেও সমস্ত নৌকো ডুবে যায়। চম্পক নগরে ফিরে আসার পথেও চাঁদকে নানা বিপদ, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু তবুও সে মনসার বশ্যতা স্বীকার করে না। দীর্ঘদিন পর পুত্রকে পেয়ে উল্লসিত চাঁদ তার বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী সন্ধানে নেমে পড়ে। সর্বগুণসম্পন্না বেহুলার সন্ধান পেয়ে অবশেষে লখিন্দর-বেহুলার বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু তবুও পুত্রের অমঙ্গল হতে পারে দেখে লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করে। কাহিনি ধারায় এরপর রয়েছে লখিন্দর দংশন পালা। মনসা ভালো করেই জানে যে, 'লোহার বাসরে যদি না মরে লখিন্দর। / তবে মৃত্যু নাহি আর শতেক বৎসর।।' ফলে মনসার পরিকল্পনা অনুযায়ী কালনাগ লখিন্দরের 'কেনুয়া আঙ্গুলে মারে বজ্রকামড়।।' মৃত লখিন্দরকে প্রথা অনুযায়ী ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। স্বামীহারা বেহুলাও ভেলায় স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, 'সমুদ্রে ভাসাইয়া দেও যথা তথা যাই', উদ্দেশ্য, 'জীয়াইব প্রাণপতি চণ্ডিকার বরে'।

এরপর ভাসান পালা। এখানে বেহুলা চরিত্রটি আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। যাত্রাকালে বিভিন্ন ঘাটের প্রসঙ্গ যেন গ্রামবাংলার ছবিকেই প্রতিফলিত করেছে আর বেহুলাও যেন হয়ে উঠেছে বাঙালি ঘরের গৃহবধূ। অবশেষে নানা সংকট অতিক্রম করে বেহুলা শিবপুরে পৌঁছায় এবং স্বামীর প্রতি অসীম ভক্তি ও নিষ্ঠার বলে সে দেবতাদের নৃত্যে-গীতে তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়, 'শোকে উপোবাসে বেহুলার রাগ নহে ঢিল। / উচ্চৈঃস্বরে গাহে গীত যেমন ককিল।।'। এখানে বেহুলা নিজের বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়েছে। সে শুধু নিজের স্বামীরই নয়, বরং ছয় ভাসুরেরও প্রাণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কাব্যের অন্তিমে বেহুলা তার শ্বশুর চাঁদকে মনসার মায়া তথা মহিমা সম্পর্কে বোঝাতে সক্ষম হয়। কিন্তু চাঁদের অঙ্গীকার, 'দক্ষিণ হস্তে পূজি আমি ত্রিদশ কোটি দেবা। / বাম হস্তে পুষ্প দিব মার্গে দিব সেবা।' দেবী মনসা এতেই সন্তুষ্ট হয়। চাঁদ কেবল সন্তানই নয়, বন্ধু ধন্বন্তরি ও সমস্ত নৌকো ফিরে পায়। কাব্যের শেষ অংশে বেহুলা সমস্ত ঘটনা ও দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটিয়ে দেয়—

'অনিরুদ্ধ ঊষা এই আমরা দুইজন। মহাদেবের শাপে জন্ম হইল ভুবন।।
শ্বশুরের বাদ পদ্মার বাদ করিলাম উদ্ধার। শিবের আজ্ঞায় জন্ম হইল দোহাকার।।
পদ্মার কর্মে আসি বাদ করিলাম দূর। দোহে চলিয়া যাব মহাদেবের পুর।।'

এবং অবশেষে লখিন্দর-বেহুলা স্বর্গরথে শিবপুরে গমন করে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুসারে মনসার নামকরণ বিষয়ে বলুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

২। সৎ মা দুর্গার সঙ্গে মনসার সংঘাতের কাহিনি সংক্ষেপে বলুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৩। চন্দ্রধরের পূজা ছাড়া মনসার আরও দু'টি পূজা প্রাপ্তির কাহিনি বলুন। (১০০ শব্দের মধ্যে)

৪। চন্দ্রধর থেকে মনসার পূজা আদায়ের কাহিনি সংক্ষেপে বলুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৫ চরিত্র-চিত্রণ

৬.৫.১ মনসা

মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আশ্রয় হচ্ছে মনসা। শিবকন্যা হয়েও সে বঞ্চিতা, অভাগী। কাব্যের শুরুতেই মনসা স্বপ্নাদেশে কবিকে তার জীবনের অপ্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত করেছে—

'পুষ্পবনে জন্ম আমার পৃথিবীর অধঃ। বাপের সনে পরিচয় সৎ মায়ের বধ।।
চণ্ডীর চৈতন্যগীত রচিও সম্ভেদ। আমার বিবাহের পর স্বামীর বিচ্ছেদ।।
অষ্টনাগের জন্ম গাইও ক্ষীরদ মথন। বিষ খাইয়া মহাদেব হইল অচেতন।।
মোর দুঃখের কথা শুনি না হইও হুতাশ। সৎমায়ের বাক্যে বাপে দিল বনবাস।।'

এই অপ্রাপ্তিই মনসাকে রুক্ষ করে তুলেছে। গৌরীর সঙ্গে সংঘাতে সে তার একটি চোখ হারিয়েছে। জীবনে কখনো প্রকৃত মায়ের স্নেহ পায়নি, পরিবারের ভালোবাসা পায়নি, সংসারের সুখ পায়নি, দেবীর স্বীকৃতি পায়নি। স্বাভাবিক ভাবেই ক্রোধ ও বিদ্বেষে সে জর্জরিত হয়েছে। বনবাস পালায় মনসার বিলাপ চরমে পৌঁছায় যখন গৌরীর নির্দেশে শিব মনসাকে বনবাসে পাঠাতে বাধ্য হয়। মনসা নিজের এই দুর্দশার জন্য নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করেছে—

'পদ্মা বলে শুন কথা জগতের আই। আমার কর্মফল তোমার দোষ নাই।।
অযোনিসম্ভবা আমি জন্মি পদ্মবনে। জন্মিয়া মায়ের স্তন না দিলাম বদনে।।'

ফলে মনসা নিজেকে 'জনম দুখিনী' মনে করেছে,

'জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ লই কোলে। পাষাণ আগুন হয় আমার কর্মফলে।।'

এরপরই মনসা তার জীবনের সবচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি'র কথা প্রকাশ করেছে, 'দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থান'।

তাই সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠালাভ'ই মনসার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হয়ে উঠল। মনসা সর্বশক্তিময়ী, তার আঘাতে চণ্ডী, যম সকলেই পরাজিত হয়েছে। অথচ মানব চাঁদ সদাগরকে সে বশ্যতা স্বীকার করাতে পারেনি, এটাই মনসার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ও কাব্যের মূল সংঘাত। সে প্রলোভন দেখিয়ে রাখালদের দ্বারা পূজিত হয়েছে, পরাক্রম দেখিয়ে মুসলমান সমাজে পূজিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কৌশলই চাঁদকে টলাতে পারেনি। ফলে মনসা চাঁদের ছয়পুত্রদের হত্যার মতো চরম সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছে। চাঁদের সহায়ক ধন্বন্তরিকে ছলনা করে হত্যা করেছে, তার বাণিজ্যের সমস্ত নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে, এমনকি শেষে লোহার বাসর ঘরে ঢুকে লখিন্দরের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। তবুও চাঁদ অটল। আসলে চাঁদের মনসা-বিদ্বেষের এই চরম স্থিতি মনসার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে যেন আরও জাগিয়ে তুলেছে যা চরিত্র নির্মাণের সার্থকতার দিক থেকে সফল হয়ে উঠেছে।

৬.৫.২ চাঁদ সদাগর

চাঁদ সদাগর বণিক, শিব ভক্ত। বিজয়গুপ্ত চাঁদের পিতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

'নামেতে বিজয় সাধু চম্পক নগর। তার ঘরে জন্ম হইল চান্দ সদাগর।।

জন্মিয়া সে ক্ষিতিতলে করে নানা পূজা। একমনে ভক্তিভাবে পূজে দশভূজা।।

এই চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার সংঘাত কিন্তু শুধু এই জন্মে নয়। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন যে একবার চাঁদ মনসার কাছে গেলে— 'চান্দরে দেখিয়া যত নাগে লাগে ডর। / হেন বস্তু ছিল তার মুখের উপর।।' পদ্মার আভরণ ছেড়ে সমস্ত নাগ পালিয়ে যাওয়ায় পদ্মা লজ্জিত ও অসম্মানিত হয় এবং চাঁদকে অভিশাপ দেয়, 'মনুষ্য হইয়া তুমি জন্ম পৃথিবীত।' কিন্তু চাঁদও কম নয়, সে মনসাকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে, 'পরের অনিষ্টে পদ্মা তোমার গেল কাল'। এবং অবশেষে মনসাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে, 'মহাদেব সাধি আমি চণ্ডীকার বরে। / হেন মন্ত্র সৃজিব যে নাগ পলায় ডরে।।'

মনসা যখন চাঁদের সমস্ত নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছিল, চাঁদ-অবস্থিত মধুকর ডিঙা কিন্তু প্রথমাবস্থায় ডোবাতে পারেনি। তার কারণ ব্যাখ্যায় বিজয়গুপ্ত লিখেছেন যে চাঁদের পিতা বিজয় সাধুর (কোথাও জীব সাধু বলে উল্লেখ রয়েছে) কোনও সন্তান ছিল না, ফলে সে শিবের ধ্যানে মগ্ন হল। মহাদেব তার এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে সে পুত্রবর চেয়ে নেয় এবং সেই সঙ্গে এটাও প্রার্থনা করে—

'মহাধনে ধনী হইক বিক্রম বিশাল। তোমাতে ভক্তি যেন থাকে চিরকাল।।

মোর পুত্র থাকিবেক যেই নৌকার উপর। কোন পাকে নাহি ডুবে সমুদ্র ভিতর।।'

ফলে শিবের আশীর্বাদে চাঁদ সুরক্ষিত। এমনকি সে মহাবিদ্যাও জানত, যার দ্বারা ভস্মীভূত উপবন সে আবার বাঁচিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই মহাজ্ঞান থাকলে চাঁদকে যে পরাস্ত করা যাবে না সে কথা মনসা ভাল করেই জানত। তাই নটীর বেশে, কাম বানে বিদ্ধ করে মনসা চাঁদের কাছ থেকে সেই মহাজ্ঞান হরণ করতে সক্ষম হল। চাঁদ মনসার এই ছলনাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনি, বরং নিজের দৃঢ়-মনস্কতা জাহির করেছে, 'মহাজ্ঞান হরি মোর তোর এত রং। / শত জ্ঞান গেলে চান্দ কার্যে না দেয় ভঙ্গ ।।'

হনুমানের সাহায্যে চাঁদের নৌকাডুবির পর চাঁদ ইচ্ছে করলে মনসাকে পুজোর আশ্বাস দিয়ে বেঁচে যেতে পারত এবং সুখের সংসারে ফিরে আসতে পারত কিন্তু আত্মসম্মানের খাতিরে চাঁদ সেটা করেনি। ফলে তাঁকে অনেক লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে এই লাঞ্ছনা অংশটিতে বিজয়গুপ্ত যেন চাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আপস করেছেন। এখানে চাঁদ চরিত্রটি একটি স্থূল চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত কবি কাব্যে হাস্যরস সঞ্চারের খাতিরে চাঁদের দুর্দশাকে ট্র্যাজিক না করে হাস্যকর করে তুলেছেন। কিন্তু চম্পক নগরে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ নিজের স্বমহিমায় ফিরে এসেছে। হঠকারিতাই চাঁদ চরিত্রটির একটি বৈশিষ্ট্য। তাই নগরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রলাভে আত্মহারা চাঁদ লখিন্দরের বিয়ের প্রস্তুতি চালায়। বেহুলা পুত্রবধূ হিসেবে উপযুক্ত কি না তা যাচাই করে, আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করে এবং সন্তানের সুরক্ষার খাতিরে লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করে। কিন্তু তবুও পুত্রের প্রাণ রক্ষা করতে পারেনি। তবে কাব্যের শেষে বেহুলার পতিভক্তি ও ত্যাগ চাঁদকে ভাবতে বাধ্য করে এবং 'বাম হস্তে পুষ্প দিব' বলে রাজি হয় এবং এতে 'হরিষ হইল বড় পদ্মার অন্তর।'

৬.৫.৩ লখিন্দর

মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দর এমন একটি চরিত্র যাকে ভিত্তি করে কাহিনির সংঘাত ও উদ্দেশ্য সমাধানের পথে এগিয়েছে, অথচ চরিত্রটি স্বমহিমায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। পূর্বজন্মে দেবলোকের শিল্পী অনিরুদ্ধ তালভঙ্গের অপরাধে শিবের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্যে সনকার গর্ভে জন্ম লাভ করে। তার দ্বারা মনসা-চাঁদের যে সংঘাত তা সমাধান হয়ে মর্ত্যে মনসার পুজো প্রচার হবে এটাই ছিল লখিন্দরের জন্মের পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য, 'মোর বরে তাহার (সনেকার) গর্ভে জন্মিবে কুমার/ তাহা হইতে হবে মোর বাদের উদ্ধার'। এমনকি দেবলোকের স্ত্রী ঊষাই মর্ত্যে বেহুলা হয়ে জন্ম নেবে এবং তাদের বিয়ে হবে এটাও আগে থেকে ঠিক হয়ে রয়েছে। ফলে লখিন্দরের আবদ্ধ জীবনবৃত্তে নতুন করে কিছু করার অবকাশ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সরোবরে বেহুলাকে প্রথম দেখার পর লখিন্দরের মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ঘটিয়ে বিজয়গুপ্ত লখিন্দরকে রোম্যান্টিক নায়ক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগটাও হারিয়েছেন। শুধু বাসর ঘরে সর্পাঘাতের পূর্বে ও পরে তাকে কিছুটা সজীব মনে হয়েছে, কিন্তু তার পর

দীর্ঘ সময় চরিত্রটি মরদেহ হয়ে ভেলায় ভেসেছে। ফলে লখিন্দর চরিত্রটি শুধু বিজয়গুপ্তের কাব্যেই নয়, বরং বলা যায় সমস্ত মনসামঙ্গল কাব্যেই উপেক্ষিত।

৬.৫.৪ বেহুলা

লখিন্দর চরিত্র নির্মাণে কবি অধিক সময় ব্যয় না করলেও বেহুলার ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাই বেহুলার জীবনের আদর্শ যা মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিল। বেহুলার পতিভক্তির পূর্বাভাস পূর্ব জন্ম অর্থাৎ ঊষার মধ্যেই লক্ষ করা যায় যখন সে পতির সঙ্গে সহমরণে নিজেকে সমর্পন করে, 'ঊষার শরীর যেন ননীর পুতুলী। / হেন শরীর কাটিয়া অগ্নিরে দিল ঢালি।।' ব্রহ্মা এতে সুপ্রসন্ন হয়ে বর দেয়, 'সতীজ্ঞানে গৌরব করিবে সর্বজন। / মরিলে মরা জীয়াইবা হারাইলে পাইবা ধন।' মর্ত্যলোকে সাহে বানিয়া ও সুমিত্রার কন্যা বেহুলার মধ্যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় আমরা পাই যখন চাঁদ সদাগর তাকে যোগ্য পুত্রবধূ হবে কি না তা পরীক্ষা করতে আসে। চাঁদের আবদারে বেহুলার লোহার কলাই-ভাত রান্না করার দৃশ্যটি বিজয়গুপ্ত সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বেহুলার চরিত্রের অসাধারণত্ব ফুটে উঠেছে লখিন্দরের মৃত্যুর পর যখন সে মৃত স্বামীর সঙ্গে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনাতে ভেলায় ভেসে যেতে চেয়েছে, 'মরা স্বামী লয়ে যাব দেবের সমাজ, ... জিয়াইব নিজ পতি ভাসুর ছয়জনা।।' এরপর ভাসান পালায় বেহুলা চরিত্রটিকে বিজয়গুপ্ত তিল তিল করে নির্মাণ করেছেন। বিভিন্ন ঘাটে নানা প্রলোভন, সমস্যা, প্রত্যাহ্বান, দুর্দশাকে হেয় জ্ঞান করে বেহুলা নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকেছে এবং অবশেষে দেবলোকে পৌঁছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। বুদ্ধিমতী বেহুলা দেবতাদের, এমনকি মনসাকেও তুষ্ট করে শুধু স্বামীর প্রাণ'ই নয়, অন্য ছয় ভাসুরেরও প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে এবং মনসা-চাঁদের দ্বন্দ্বের সমাধানের খাতিরে শ্বশুরকে মনসা-পুজোয় আগ্রহী করে তুলেছে। কিন্তু এত ত্যাগ সত্ত্বেও বেহুলাকে কিন্তু সীতার মতো নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে হয়েছে, লখিন্দর নির্দেশ দিচ্ছে— 'তোর সতীপনা দেখুক লোক সকল। / গাঙ্গ হইতে তোল তুমি এক খাড়ৈ জল।।' উল্লেখ্য, এখানে বেহুলার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি গৃহবধূর রূপটি প্রত্যক্ষ করি তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত সর্বকালের হতভাগা চিরন্তন নারী সত্তাও খুঁজে পাই।

৬.৫.৫ সনকা

সনকা অনেকটাই রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে। সে একাধারে ভক্ত, গৃহিণী, মাতা এবং শাশুড়ি। স্বামী চাঁদ সদাগর শৈব এবং মনসাকে অপছন্দ করে জেনেও সনকার মধ্যে মনসা-ভক্তি বিন্দুমাত্র লাঘব হয়নি। এর জন্য স্বামীর কাছে তাকে লাঞ্ছিত হয়েছে, চাঁদ-সোনেকারে ধেয়ে যায় মারে কিল লাথি'। সনকা ভালো করেই জানে যে তার স্বামীর পদাঘাতে মনসার ঘট ভাঙা ঘটনাটি মোটেও

ভালো লক্ষণ নয়। তাই তার মাতৃ-মনে বার বার বেজে উঠেছে অমঙ্গলের শঙ্কা। তবে সে চিরকাল স্বামীর হঠকারিতা চুপচাপ সহ্য করেনি। ছয় পুত্র হারানোর পরও চাঁদ যখন তাকে মনসাভক্তি থেকে বিরত থাকতে বলেছে, তখন সনকা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে— 'তুমি হেন স্বামী যার সে বাঁচে কেনে। / সহবাসে কাজ নাই চলিলাম বনে।।' সনকার ভক্তিতে মনসা বার বার প্রসন্ন হয়েছে এবং পুত্রবর প্রদান করেছে। সনেকার মাতৃত্ব ও গৃহিণীপনার সুন্দর ছবি এঁকেছেন বিজয় গুপ্ত যখন ছয় পুত্র পান্তাভাত খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং সনকা সেই পান্তাভাতের সঙ্গে নানা রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে। লখিন্দরকে হারিয়ে সনকার বুকফাটা কান্না তথা পুত্রবধূর প্রতি সন্তানসম প্রেম আমরা স্ত্রীর অংশটিতে থেকে অনুধাবন করতে পারি—

'যাইও না যাইও না লখাই এইখানে রও। আগে তোমার মায় মরুক পাছে তুমি যাও।।
সোনেকা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ। লখাইর বদলে তুমি মা বলিয়া ডাক।।'

৬.৫.৬ বচাই

মনসামঙ্গলের একটি অতি গৌণ চরিত্র বচাই। পদ্মাকে নিয়ে শিবপুরে গমনকালে মহাদেব এই বচাইর ভবনে উপস্থিত হয় এবং ফুলের সাজিতে পদ্মাকে রেখে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নানের জন্য প্রস্থান করে। কৃষিকর্ম শেষ করে বচাই ঘরে ফিরে সেই ফুলের সাজি দেখে কৌতূহল ওঠে এবং সাজির ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পমধ্যে সুন্দরী নারী আবিষ্কার করে আহ্লাদিত হয়ে ওঠে—'নাচিতে লাগিল বচাই হাতে তালি দিয়া, / মহাদেব জানে আমি করি নাই বিয়া।।' বচাইর এই আচরণে মনসা স্তম্ভিত হয় এবং বিষচোখে বচাইর দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বচাই প্রাণ হারায়। এরপর শিবের নির্দেশে মনসা আবার বচাইর প্রাণ ফিরিয়ে দেয় এবং বচাইও ভক্ত হয়ে দেবী মনসার পুজো করে।

কাহিনি ধারায় বচাইর অবস্থান অতি সামান্য হলেও এই চরিত্রটির হাত দিয়েই মনসা প্রথম পুজো লাভ করে। কবি বিজয়গুপ্তও মনসাপুজো আয়োজনের একটি বর্ণনা এখানে সরস ভাষায় তুলে ধরেছেন, 'কুমার দোকানে কিনে ঘট আর শরা। / মালীর দোকানে কিনে পুষ্প ছড়া ছড়া'। অবশেষে বচাইর ভক্তিতে মুগ্ধ হয়ে 'রাজ্যের রাজা হও' এই বর দিয়ে মনসা প্রস্থান করে।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'গ'

১। বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুসরণে মনসা চরিত্র আলোচনা করুন।(১৫০ শব্দের মধ্যে)

২। বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুসরণে চাঁদ সদাগর চরিত্র আলোচনা করুন।(১৫০ শব্দের মধ্যে)

৩। বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুসরণে সনকা চরিত্র আলোচনা করুন।(১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪। বিজয়গুপ্তের কাব্য অনুসরণে বেহুলা চরিত্র আলোচনা করুন।(১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৬ সমাজ ভাবনা

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে পারে সেটা হল কাব্যে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজচিত্র। প্রাক্-চৈতন্যযুগীয় বঙ্গদেশের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাপন, আচার-আচরণ, লোকবিশ্বাস, খ্যাদ্যাভ্যাস, অঙ্গসজ্জা, পরিবেশমূলক তথ্য, ভৌগোলিক তথ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য, পেশা, ভাষা, নারীর অবস্থান ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি তথ্য ও বর্ণনা আমরা বিজয়গুপ্তের কাব্যে খুঁজে পাই যা কাহিনিধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি হয়ে উঠেছে তৎকালীন সমাজ-ভাবনার এক যুক্তিনিষ্ঠ দলিল।

কাব্যের শুরুতেই কবির আত্মপরিচয় অংশে তৎকালীন রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার পরিচয় পাই যা ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান। সমাজে বর্ণভেদ বর্তমান ছিল। অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেন—

> "ব্রাহ্মণের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ ছিল। লখাইয়ের বিবাহে— 'ভট্টাচার্যরে দিলা রজত কাঞ্চন। / চক্রবর্তীরা পাইল ইহার নিয়ম।'... নীচুজাতের অস্পৃশ্যতা ছিল ভয়াবহ... ডোমদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। শেষে চাঁদ একজন পাইক খুঁজছেন যে ডোমকে ছুঁতে পারে!"

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের ছবি হাসন-হুসন পালায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেখানে 'গোস্ত' খাইয়ে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করার প্রসঙ্গ রয়েছে, আর কাছিমের ডিম খাইয়ে মুসলমানের। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় নারীর সম অধিকার তথা সম অবস্থান ছিল না, তাই যমের প্রতি মনসার ক্ষোভ 'স্ত্রী জাতি দেখিয়া মোরে নাহি ভাবে সম'। সমাজে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে— 'স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি'। শুধু তাই নয়— 'স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কভু না কহিবে। / কহিলে বিপদ তার অবশ্য হইবে।।' পারিবারিক সংঘাত ও স্ত্রীকে প্রহারের দৃশ্যও প্রতিফলিত হয়েছে কাব্যে, চাঁদ— 'সোনেকারে ধেয়ে যায় মারে কিল লাথি।।' নারী যে আসলে ত্যাগের প্রতীক তা ভাসান পালায় বেহুলার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হলেও বেহুলাকে কিন্তু যোগ্য পাত্রী কি না তার প্রমাণ দিতে হয়েছিল শ্বশুরের সম্মুখে, এমনকি সীতার মতো নিজের সতীত্বের প্রমাণও দিতে বাধ্য হয়েছে সে। এছাড়াও কাব্যটিতে প্রতিফলিত পুরুষের বহুবিবাহ, সপত্নী সমস্যা এবং সেই সঙ্গে নারীর সতীদাহ প্রসঙ্গ একটি মূল্যবান সংযোজন, চাঁদ বলেছে— 'বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাস কর আছে কি সাহস। / লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘচুক অপযশ।।'

মনসার বিবাহ পালায় বিবাহকেন্দ্রিক বাঙালির বিভিন্ন সংস্কার কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায়। নারদের ঘটকালীতে মনসার বিয়ে ঠিক হলে বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, এয়োদের জোকারের মধ্যে দিয়ে বিবাহের মঙ্গলবার্তা ঘোষিত হয়, এবং— 'মঙ্গল সরা লইয়া কাঁখে / চণ্ডিকা চলিল আগে / পট্টবস্ত্রে ঢাকিয়া শরীর।।' মঙ্গল ঘট স্থাপন, জামাই বরন, সাতপাক প্রদক্ষিণ, কন্যাদান, শুভদৃষ্টি, ফুলসজ্জা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ বাঙালির বিবাহ-প্রথাকে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত করেছে। লখিন্দর-বেহুলার বিবাহের পূর্বে কোষ্ঠীবিচার প্রসঙ্গও রয়েছে। এছাড়াও জন্মকেন্দ্রিক নানা সংস্কার কাব্যে উঠে এসেছে, যেমন— 'সুবর্ণের

কাটারি দিয়া নাড়ি করে ছেদ', 'ব্রহ্মা আসি করেন মায়ের নামকরণ', 'ছয় দিন ষষ্ঠী পূজা নিশি জাগরণ', 'ছয়মাস... অন্নপ্রাসন... অন্ন আরম্ভন', 'কর্ণভেদ' ইত্যাদি। মৃত্যুকেন্দ্রিক নানা সংস্কার তথা বিশ্বাসও আমরা কাব্যটিতে খুঁজে পাই, যেমন— 'সর্পঘাতে মৈলে লোকে অগ্নিতে না পুড়ি। / কলার মাজুষে করি ভাসাও গাঙ্গড়ি' ইত্যাদি।

সেযুগের বাঙালির খ্যাদ্যাভাসের এক বিস্তৃত তালিকা আমরা বিজয়গুপ্তের কাব্যে খুঁজে পাই। সনকার রন্ধন তালিকায় আমিষ-নিরামিষ নানা ব্যঞ্জন রয়েছে, যেমন— 'নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমারের শাক। / ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে কুমারের চাক।' এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন শাক-সব্জি, ডাল, সুক্ত ইত্যাদি। আমিষ ব্যঞ্জনও কম নয়, যেমন— 'ভাজিয়া রোহিত আর চিতলের কোল। / কৈ মৎস দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।।' সেযুগে পান্তাভাতের চাহিদাও আমরা এখানে খুঁজে পাই।

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যমগুলির মধ্যে জলপথে নৌকো, জাহাজ এবং স্থলপথে পালকি, ঘোড়া ইত্যাদি। বস্তুবদল পালায় ব্যবসাবাণিজ্য, আমদানি রপ্তানি, বিভিন্ন সামগ্রীর বিনিময় প্রথা ইত্যাদির আভাস পাই—

'মুসুরির বদলে লইল রক্ত হিঙ্গুল। বাউস বদলে দ্রাক্ষা লইল বহু মূল।।
ছাগল বদলে হরিণ লইল বড় দেখি ভাল। বারকোষ বদলে লইল পিতলের থাল।।'

অতএব সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখব যে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল মধ্যযুগীয় কাব্যধারার এমন একটি মূল্যবান সংযোজন যার মাধ্যমে ভেসে উঠেছে সে যুগের সমাজের এক বাস্তব ছবি।

৬.৭ কাব্যমূল্য বিচার

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের বিস্তার ও জনপ্রিয়তার মূল কারণ হচ্ছে এর অভিনবত্ব, কাব্যগুণ ও কাহিনি সম্ভার। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন, 'বিজয়গুপ্তের কবিপ্রতিভায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের যশ প্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল' তবে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, 'বিজয়গুপ্তের কবিত্ব যে খুব উচ্চস্তরের ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। পদ্মাপুরাণ প্রধানতঃ করুণ রসের আকর। এই করুণ রস-প্রধান কাব্য-সৃষ্টিতে সার্থকতা অর্জন করিতে হইলে যে গভীর ভাব-প্রবণতার প্রয়োজন হয় বিজয়গুপ্তের তাহা অভাব ছিল। বিজয়গুপ্তের দৃষ্টি ব্যক্তিচরিত্রের অন্তস্থল অপেক্ষা সমষ্টির দিকেই অধিক আকৃষ্ট ছিল।' তবে যে বিষয়টি বিজয়গুপ্তের কাব্যের উৎকর্ষ দিক বলে তিনি মনে করেছেন সেটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিফলন। এক্ষেত্রে বলতে হয় যে সামাজিক বিষয়বস্তু অপেক্ষা রাজনৈতিক বিষয় কাব্যটিতে অতি স্বল্পই রয়েছে। কিন্তু তবুও তা সমকালের প্রতিবিম্ব হিসেবে ধরা দিয়েছে।

চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিজয়গুপ্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হচ্ছে, কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চরিত্রগুলিকে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে বাস্তব ও লৌকিক

প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আশুতোষবাবু বলেছেন, 'বিজয়গুপ্ত কল্পিত দেবচরিত্রগুলিও তৎকালীন সমাজের এক একটি জীবন্ত মানব চরিত্র রূপেই অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দেবত্বের লেশ মাত্র নাই।' অন্যদিকে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'চরিত্র বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, দেব-দেবীর চরিত্রে কোনো প্রকার মহিমা রক্ষিত হয় নাই। চণ্ডী-মনসা-গঙ্গার কোন্দোল কলহবিদ্যাপটীয়সী জনপদবধূদিগকেও লজ্জা দিবে। মহাদেবের গঞ্জিকা-ধুস্তর-সেবী কামলম্পট চরিত্র প্রায় সমস্ত শাক্ত মঙ্গলকাব্যে একভাবে চিত্রিত হইয়াছে।' তবে যাই হোক কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা শিবের সংসার যেন আমাদের পরিচিত কোনো দরিদ্র গ্রাম্য পরিবারের প্রতিচ্ছবি। মনসার বিবাহ প্রসঙ্গে শিবের প্রতি চণ্ডীর উক্তিগুলি দারিদ্র্যলাঞ্ছিত বাঙালি পারিবারিক রূপকেই প্রতিফলিত করেছে—

'হাসিয়া বলেন চণ্ডী আই তোমার মুখে লাজ নাই
তৈল সিন্দুর পাইব কোথায়।
এয়ো আইবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে গুয়া খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কোথারে।।'

এর উত্তরে শিব যখন বলে—

'হাসি বলে শূলপানি এয়ো ভাণ্ডাইতে আমি জানি
মধ্যে দাণ্ডাব লেঙ্গট হইয়া।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লজ্জা পাইয়া যাবে পলাইয়া।।'

তখন কিন্তু কবি বিজয়গুপ্ত শিবের দেবত্ব হরণ করে তাকে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিভাবক তথা স্থূলরুচিসম্পন্ন ইতর ব্যক্তিতে পরিণত করে লঘু হাস্যরস সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কাব্যের গাম্ভীর্য লাঘব করেছেন। ভূদেব চৌধুরীরও শিবের এই আচরণকে ব্যভিচারী গ্রাম্য চরিত্র বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে— 'এই বর্ণনা আধুনিক রুচির দরবারে অপাংক্তেয়।' (বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম খণ্ড)। তবে বেহুলার চরিত্রটিকে কবি যেন বাঙালি ঘরের বধূ হিসেবে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। বেহুলার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লেখেন,

'চাচর মাথার কেশ চন্দন ললাটে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন মেঘের নিকটে।।
দশন মুকুতাপাঁতি অধরে তাম্বুল। নাসিকার শভা যেন জিনি তিলফুল।।
নৃত্যত যুগল যেন নয়নে কাজল। কোমল উপরে যেন যেন ভ্রমর যুগল।।

বলাবাহুল্য, সৌন্দর্য-সচেতন কবি বিজয়গুপ্তের এই বর্ণনা তৎকালীন বাঙলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর কাব্যে উপমা প্রয়োগ, অনুপ্রাস, ছন্দবোধ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিজয় গুপ্তের রচনাতেই বাঙলা কাব্য সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম ছন্দের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।' তাঁর মতে পয়ার ও ত্রিপদী ছাড়া সেই যুগে অন্য কোনো ছন্দের তেমন অস্তিত্ব ছিল না। এক্ষেত্রে কবি বিজয় গুপ্ত

নিজের মৌলিকতা প্রকাশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আধুনিক স্বরবৃত্ত ছন্দের সুরও বিজয় গুপ্তের কাব্যে কোথাও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়, যেমন—'প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।/ সবা বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।'

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত— 'বিজয় গুপ্তের কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই অধিক।' কবি পৌরাণিক বিষয়বস্তু গভীরে অধ্যয়ন করেছিলেন বলেই কাব্যে তা নিজের মতো করে লৌকিক ঢঙে বর্ণনা করেছেন। কাব্যে উল্লিখিত দেবদেবী প্রসঙ্গ, চণ্ডীর পুষ্প বনে উল্লিখিত নানা রকম ফুলের প্রসঙ্গ, যমদূতের তালিকা, নানা রকম খাদ্যসম্ভার, বিভিন্ন সাপের উল্লেখ, লোক-সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, ব্যবসা বাণিজ্যে কথা, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখের মধ্যে দিয়ে কবির পাণ্ডিত্য খুব সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। তবে সেই পাণ্ডিত্য রসাস্বাদনে ব্যাঘাত জন্মায়নি। এখানেই বিজয় গুপ্তের সার্থকতা।

বিজয় গুপ্ত খুব সচেতন ভাবে কাব্যে নানা রকম শব্দ চয়ন করেছেন। তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি নানা আরবি-ফারসি শব্দ এই কাব্যের বৈচিত্র্যকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছে। সেলাম, তুরুক, গোস্ত, হারাম, চাচা, ফুফা, তাবিজ, আহাম্মক, মোকাম, মোল্লা, কেতাব, ইনাম, ওয়াসিল ইত্যাদি নানা শব্দ পাচ্ছি যা হাসান হোসেন পালায় সার্থক ভাবে প্রয়োগ করেছেন কবি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিজয় গুপ্তের মঙ্গলকাব্যে কিছু ত্রুটি লক্ষ করে লিখেছেন, '...কাহিনীতে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য দেখা যাইবে না। মনসা-চণ্ডী-শিবের আখ্যানটুকু অনাবশ্যক এবং অনর্থক অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। চাঁদসদাগরের বাণিজ্য, বদল-বাণিজ্য ও দুর্গতির বর্ণনা নিতান্তই গতানুগতিক... বেহুলার স্বামীদেহ সহ গারুড়ীর সন্ধানে যাত্রা, পথের প্রলোভন জয়, স্বর্গে গিয়া মহাদেবাদি দেবতাদিগকে নৃত্যগীতে খুশী করিয়া স্বামী ও ভাসুরদের জীবন-সংগ্রহ এবং শ্বশুরের নিমজ্জিত তরণী উদ্ধারের কাহিনীতে বৈচিত্র্য না থাকিলেও স্বচ্ছ বর্ণনাভঙ্গিমা কথকতা ও পাঁচালীর রীতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।' তবে দেবদ্রোহী মানব চাঁদ চরিত্রটির দার্ঢ্য, পৌরুষ ও বীর্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর গৌরব লাভ করিয়াছে। ... পুত্র হারাইয়া চাঁদের গম্ভীর বিলাপ এবং সোনেকাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা মাইকেল মধুসূদনের রাবণের বিলাপ এবং মন্দোদরীকে সান্ত্বনাদানের চিত্রকে স্মরণ করাইয়া দিবে।'

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল মূলত দেবশক্তি ও মানবের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব সংঘাতের আলেখ্য। এখানে অবশেষে দেবশক্তি যে বিজয়ী হবে তা পূর্ব নির্ধারিত। ফলে প্রচলিত কাহিনির বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে প্রাক্-চৈতন্য যুগের কোনো কবি এক নতুন ধারার সৃষ্টি করবেন সে কল্পনা হাস্যকর। বরং সিদ্ধরসের অর্থাৎ প্রচলিত বিশ্বাসকে অটুট রেখে নিজস্ব কাব্য প্রতিভাকে প্রদর্শন করা'ই সে যুগের কবিদের এক স্বভাব ও উদ্দেশ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করলে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বাঙলা সাহিত্যের এক অমূল্য সংযোজন।

৬.৮ মঙ্গলকাব্য হিসেবে বিজয়গুপ্তের কাব্যের সার্থকতা বিচার

মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই, যেমন—

মঙ্গলকাব্য আসলে দেবদেবীর মহিমা বিষয়ক গান এবং এখানে দেবদেবীর পুজো প্রচারই এই কাব্যধারার মূল লক্ষ্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলও এই উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। মনসা কী করে নিম্নবর্গ, উচ্চবর্গ, এমনকি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে প্রচার লাভ করেছে তার বর্ণনা আমরা পাই। এই কাব্যটি সে-সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং এসব পালা করে নির্দিষ্ট দিনেনির্দিষ্ট স্থানে অগণন ভক্ত-শ্রোতার সম্মুখে করা হত।

মঙ্গলকাব্যের কতগুলি অঘোষিত বাঁধাধরা নিয়ম আমরা দেখে থাকি, যেমন কাব্য শুরু করার পূর্বে একটা বন্দনা অংশ থাকে যেখানে কবি বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করার পর নিজের আত্মপরিচয় তুলে ধরে অবশেষে কাব্যের মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেন। বিজয়গুপ্তের কাব্যেও আমরা বিভিন্ন দেবতার উল্লেখ পাচ্ছি, যেমন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহামায়া, গঙ্গা ইত্যাদি। এরপরই বিজয়গুপ্ত আত্মপরিচয়মূলক কিছু তথ্য প্রদান করেছেন যার দ্বারা কবির পিতা-মাতা ও জন্মস্থান সম্পর্কে জানতে পারি এবং গ্রন্থ রচনার সময়কাল অনুমান করতে পারি। আত্মপরিচয় অংশে কবি গ্রন্থ রচনার কারণও উল্লেখ করেন যা মূলত দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ। বিজয়গুপ্তের কাব্যে মনসা কবিকে স্বপ্নাদেশে বলেছে, 'গীতছন্দে রচ কিছু আমার স্তবন।'

মঙ্গলকাব্যের একটি নির্দিষ্ট সাধারণ পরিকাঠামো থাকে যেখানে কাব্যগুলিতে মূলত দেবলোক ও মর্ত্যলোকের কাহিনি বর্ণিত হয়, অর্থাৎ বৃহত্তর অর্থে আমরা কাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড এই দু'টি অংশ পেয়ে থাকি। এই দুই অংশের মধ্যে আবার একটি যোগসূত্র থাকে, যেমন দেবলোকে কোনো চরিত্র শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে জন্ম নেবে এবং তার দ্বারা সেই দেব অথবা দেবীর পুজো প্রচার হবে। কার্যসিদ্ধির পর তারা শাপমুক্ত হয়ে দেবলোকে ফিরে যাবে। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে এরূপ যোগসূত্র আমরা ঊষা-অনিরুদ্ধের মধ্যে খুঁজে পাই যারা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তাদের দ্বারা মনসার পূজা প্রচারের পর অবশেষে তারা দেবলোকে ফিরে গেছে।

মঙ্গলকাব্যের মূল দেবদেবীরা লৌকিক অর্থাৎ লোকসমাজেই তারা পূজিত। পুরাণে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীর প্রসঙ্গ কাহিনি ধারায় উঠে আসে। তবে লক্ষস্ত্রীয় যে তাদের আচার-আচরণ অনেকটা লোকায়ত জীবনের সঙ্গে সংপৃক্ত। তাই বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে আমরা যে শিবকে দেখেছি সে প্রায়ই আত্মসংযমহীন, পরনারীতে আকৃষ্ট, 'ভাঙ্গের খেয়ালে শিব ভোলা হয়ে যায়। / দাড় দিয়া জল দিল ডোমনীর গায়'। এখানে গৌরী ও চণ্ডী অভিন্না, এবং মনসাকে পরনারী ভেবে নির্বিচারে প্রহার ও চোখে আঘাত সংকীর্ণ আচরণ মাত্র, 'চণ্ডী বলে মোর ঠাঁই না রহে নারীকলা। / মোর স্বামী লবা তাই পাতিয়াছ ছলা।।'। এখানে যম মনসার কাছে

পরাভূত হয়ে কাঁদে এবং নারদ তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'নারদ বলেন যম না কান্দিও আর। / অনিরুদ্ধ ঊষা পদ্মা পাইল শিবের দ্বার।।' এখানে হনুমান পদ্মার আজ্ঞাবাহক, 'পদ্মা বলে হনুমান মোর বোল ধর। / তুমি ডুবাইয়া দেও ডিঙ্গা মধুকর'। শুধু চরিত্রেই নয়, মঙ্গলকাব্যে প্রতিফলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই লোকজীবন ও পরিচিত পল্লীগ্রামের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল তারা নিজেদের পুজো প্রচারের জন্য যে কোনো স্তরে পৌঁছাতে পারে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন, "মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী, বিশেষত দেবীরা, ভক্তের কাছে বরাভয় মূর্তিতে হাজির হয়েছেন...ভক্তের জন্য তাঁরা ন্যায়-অন্যায়বোধ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে ভক্তের শত্রুর বিরুদ্ধে বিনা কারণে খড়্গহস্ত হয়েছেন। এই সমস্ত দেবদেবীর মূলে কিঞ্চিত রূঢ়-রুক্ষ আর্যেতর প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না... আদিতে চণ্ডী ছিলেন অনার্য ব্যাধ জাতির দেবী। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি শিবের গৃহিণী পার্বতীর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। সাপের দেবী ভয়ংকরী মনসা ... শিবের মানসকন্যা বলে প্রচার করা হলো... ধর্মঠাকুর পৌরাণিক না হলেও তাঁকে প্রায় বিষ্ণু করে তোলা হয়েছে।" বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যেও আমরা লক্ষ করেছি যে বণিক তথা শৈব চাঁদ সদাগরের মনসা পুজোর মধ্যে দিয়ে দেবী মনসার সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এবং বিজয়গুপ্তের কাব্যটি মঙ্গল হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে।

৬.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম :

- মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের মাধ্যমে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল সার্থক হয়ে উঠেছে।
- মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য সাহিত্যধারায় কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল অসাধারণ কৃতিত্বের সাক্ষী রেখে গেছে।
- তাঁর কাব্যের কাহিনিধারার ভক্তিরসের পাশাপাশি সাহিত্যরস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
- তৎকালীন সমাজের এক বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিচ্ছবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
- কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যগুণ একটি স্বতন্ত্র স্থান দখল করে রয়েছে।

৬.১০ অতিরিক্ত পঠন

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার (১৯৬০ খ্রি.); বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা:লি:

২. ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ (১৯৪৭ খ্রি.); মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা বুক হাউস

৩. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পা) (প্রথম প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৪৯৬ খ্রি.); বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, নিউ বইপত্র, কলকাতা

৪. সেন, সুকুমার; (১৯৪০ খ্রি) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স

৬.১১ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক' ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত:পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার গইলা গ্রামে (সে যুগে ফুল্লশ্রী বলে পরিচিত) বিজয় গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।.....দেবী মনসা কেনই-বা বিজয় গুপ্তকে কাব্যরচনার আদেশ দিয়েছেন সেই ব্যাখ্যাও উল্লেখ রয়েছে বিজয় গুপ্তের কাব্যটিতে।..... অসিতকুমার বলেছেন, 'বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।" -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের রচনাকাল নিয়ে নানা সংশয় রয়েছে, কারণ কবি এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ উল্লেখ করেননি বরং কালজ্ঞাপক কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন। .....অসিতকুমার বলেছেন, 'বিজয়গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।" ..... অতএব আমরা লক্ষ করলাম যে কাব্য রচনার সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে বেশ মতানৈক্য রয়েছে।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ' ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: কবি গ্রন্থ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মনসার স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং নিজের আত্মপরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন।..... বিষমুখ দেখে নাম হলো 'বিষহরী'। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'গৌরী কোন্দল' পালার মূল বিষয় হচ্ছে মনসা ও গৌরী অর্থাৎ চণ্ডীর সংঘাত।..... এখানেও শিবের কথায় অবশেষে মনসা চণ্ডীর প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। ..... গৌরী অর্থাৎ চণ্ডীর অভিমানে অবশেষে শিব মনসাকে বনবাসে পাঠিয়ে নিজেও মর্মাহত হয় এবং তার অশ্রু থেকে জন্ম নেয় নেতা। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: কাব্যের নরখণ্ডের প্রথম পর্যায়ে নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে দেবীর পুজো প্রাপ্তি বর্ণিত হয়েছে। ..... এই খবর পেয়ে হাসন-হুসন মনসার ভক্তদের আক্রমণ করলে মনসা সাপ পাঠিয়ে তাদের শাস্তি প্রদান করে ও অবশেষে মুসলমান সমাজেও পূজিত হয়।-এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৪। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মনসার পুজোপ্রাপ্তির বাসনা এখনও মেটেনি কারণ সমাজের উচ্চবর্গের কাছে সে উপেক্ষিতা।..... 'ঝালুবাড়ির পূজা পালা'-য় মনসা তার ভক্ত সনকাকে পুত্রপ্রাপ্তির বর প্রদান করে। .....দেবী মনসা এতেই সন্তুষ্ট হয়। চাঁদ কেবল সন্তানই নয়, বন্ধু ধন্বন্তরি ও সমস্ত নৌকো ফিরে পায়। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'গ' ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আশ্রয় হচ্ছে মনসা। শিবকন্যা হয়েও সে বঞ্চিতা, অভাগী। ..... মনসা সর্বশক্তিময়ী, তার আঘাতে চণ্ডী, যম

সকলেই পরাজিত হয়েছে।..... আসলে চাঁদের মনসা-বিদ্বেষের এই চরম স্থিতি মনসার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে যেন আরও জাগিয়ে তুলেছে যা চরিত্র নির্মাণের সার্থকতার দিক থেকে সফল হয়ে উঠেছে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: চাঁদ সদাগর বণিক, শিব ভক্ত। ..... ফলে তাঁকে অনেক লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হয়েছে। ..... তবে কাব্যের শেষে বেহুলার পতিভক্তি ও ত্যাগ চাঁদকে ভাবতে বাধ্য করে এবং 'বাম হস্তে পুষ্প দিব' বলে রাজি হয় এবং এতে 'হরিষ হইল বড় পদ্মার অন্তর।' -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: সনেকা অনেকটাই রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠেছে।..... লখিন্দরকে হারিয়ে সনকার বুকফাটা কান্না তথা পুত্রবধূর প্রতি সন্তানসম প্রেম আমরা নিচের অংশটিতে থেকে অনুধাবন করতে পারি— ..... -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৪। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: স্বামীর প্রতি নিষ্ঠাই বেহুলার জীবনের আদর্শ যা মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিল।..... উল্লেখ্য, এখানে বেহুলার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বাঙালি গৃহবধূর রূপটি প্রত্যক্ষ করি তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা লাঞ্ছিত সর্বকালের হতভাগা চিরন্তন নারী সত্তাও খুঁজে পাই। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ৬.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' সার্থক মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠেছে কি না বিচার করুন।

২। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে প্রতিফলিত তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি রূপরেখা অঙ্কন করুন।

৩। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে দেবশক্তি ও মানব শক্তির যে দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

৪। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাব্যমূল্য বিচার করুন।

৫। 'জনম দুখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।/ যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল।।'— বিজয়গুপ্ত তাঁর 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসাকে একটি ট্র্যাজিক চরিত্র রূপে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন কি না বিচার করুন।

৬। 'মনসামঙ্গল বাঙালির মহাকাব্য।'— সমালোচকের এই বক্তব্যের আধারে বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের মূল্যায়ন করুন।

*** *** ***